পাঠকের ঝুঁটি ধরে নাড়া দেবে এরকম লেখা বাংলা সাহিত্যে বিরল

অশ্রুকুমার সিকদার এর এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাহিত্যিক বিপুল দাস

তাঁর পাণ্ডিত্য বা বিষয়বৈদগ্ধ্য প্রশ্নাতীত, সেদিন বিকেলে এই সাক্ষাৎকারের জন্য পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালা ভেঙে আমরা চলে গিয়েছিলাম অশ্রুকুমার সিকদার-এর অন্তরঙ্গ জীবনচর্যার দিকে। বাংলা সাহিত্যিক - সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, পরিধির এক প্রান্তে বসে সাধকের নির্জনতায় তাঁর সারস্বত সাধনা। কোনো অভিযোগ নেই, অতৃপ্তি নেই। গভীর বিশ্বাস থেকে বলেছেন তৃপ্তির কথা। বহিরঙ্গের আড়ালে এক অন্তরঙ্গ অশ্রুকুমার সিকদারকে পাওয়া গেল তাঁর ঘরের আড্ডায়।

বংলা বই -এর পক্ষে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সাহিত্যিক বিপুল দাস

আকাদেমি উত্তরবাংলার এক চা-বাগানে আপনার জন্ম। পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার জন্য এ শহরের বাইরে কিছুদিন কাটালেও আবার এখানেই ফিরে এসেছেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে একচল্লিশ বছর শিক্ষকতার জীবন আপনার। আচ্ছা স্যার, আপনার কি কখনও মনে হয়েছে কোনো বড়ো শহরে থাকলে, নাগরিক পরিকাঠামোর সুবাদে আপনার সৃষ্টিশীলতা আরও পথ খুঁজে পেত?

অশ্রুকুমার আমি এ ব্যাপারটা কখনও ভাবিনি। আর, কী হলে কী হত— এ ব্যাপারটা আমার মাথায় কখনও কাজ করে না। পারিবারিক প্রয়োজনে এই শহরে আমাকে থেকে যেতে হয়েছে। পরবর্তীকালে কখনও সুযোগ এলেও পারিবারিক কারণে সে সুযোগ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু মোটের ওপর আমার কোনো আক্ষেপ নেই, অতৃপ্তি নেই। বরং একরকম তৃপ্তি পেয়েছি বলা যায়।

আকাদেমি মফস্‌সল শহরে আপনি মূলত যে ধরনের কাজ করেছেন, সেক্ষেত্রে মনে হয় প্রায় পাহাড়প্রমাণ বাধা ঠেলে আপনাকে এগোতে হয়েছে। তবু আপনি নবীন যদুর বংশ বা আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়-এর মতো সিরিয়াস সিরিয়াস কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতাগুলো একটু বলুন আমাদের।

অশ্রুকুমার এখানে বসে কাজ করার জন্য কিছু অসুবিধা আমার হয়েছে ঠিকই। আমি...লাইব্রেরি এখানে খুব ভালো কিছু নেই। আমাদের চাকরিজীবনের প্রথমদিকে বেতন খুব বেশি ছিল না। পারিবারিক দায়িত্ব ছিল। তার মধ্যেও আমি বইপত্র কিনেছি, আর সেভাবেই পড়াশোনা করেছি, লেখার ব্যাপারটা তো কিছুটা আকস্মিক। বুদ্ধদেব বসুর একটা বই পড়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। তিনি সেই চিঠি পড়ে খুব খুশি হয়েছিলেন বোঝা যায়। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন আমি কেন কবিতা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখছি না। তখনও আমি কলেজে পড়াতে আরম্ভ করিনি। কলেজে পড়াতে আরম্ভ করার পর ইয়েটস্ এবং জীবনানন্দকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে বুদ্ধদেবকে পাঠিয়েছিলাম। বুদ্ধদেব সেটা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেননি। তিনি জানিয়েছিলেন অমনোযোগী পাঠকের মনে হতে পারে জীবনানন্দ ভীষণভাবে ইয়েটস্ দ্বারা প্রভাবিত। তা, আমার একটু খটকা লেগেছিল। অমনোযোগী পাঠকের জন্য আমি দায়ী হব কেন। কিন্তু, যাই হোক, পরে লেখাটি অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত উত্তরসূরী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে-কোনো কারণেই হোক অনেকের নজরে পড়ে, অনেক সম্পাদক তারপর আমার কাছে লেখা চাইতে শুরু করেন। তারপর আমি লিখতে থাকি; সেই লেখার প্রয়োজনে বইপত্র পেতে আমার অসুবিধা হয়েছে। যেটা আমার সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা ছিল, সেটা হচ্ছে সমধর্মা কারও সঙ্গে একটু আলোচনা করার সুযোগের অভাব। আমার মাথায় একটা চিন্তা এল বা সেই চিন্তাটাকে যাচাই করে লেখার জন্য কারও সঙ্গে কথা বলার লোক আমি পেতাম না। এই সমস্যাই আমাকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করেছে। আবার, আর-একটা দিকে হয়তো সুবিধাই হয়েছে। অবসর অনেক বেশি পেয়েছি। নানারকম কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তে হয়নি। পড়াশোনাটাই একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আমি নিবিষ্টভাবে আমার পড়া এবং লেখার কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছি।

আকাদেমি তা ছাড়া স্যার, ছোট শহর হওয়ার জন্য যোগাযোগের ব্যবস্থাও তত ভালো ছিল না। রেফারেন্স বইপত্র পেতেও তো আপনার যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে।

অশ্রুকুমার হ্যাঁ, সে-ও হয়েছে। তবে কলকাতার বন্ধুবান্ধব, তারা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। তখন তো টেলিফোনের সুবিধাও আমার হাতের বাইরে ছিল। তা সত্ত্বেও আমি প্রচুর সুবিধা পেয়েছি।

আকাদেমি প্রাবন্ধিক হিসেবে সারস্বত অঙ্গনে আপনি সফলভাবে হেঁটেছেন। এ কি পূর্বপরিকল্পিত ছিল? গল্প, কবিতা, নাটক— যে কোনো একটাকে বেছে নিতে পারতেন না? না কি কোনো বিশেষ তাড়না কার করেছে?

অশ্রুকুমার না, আসলে তেমন বিশেষভাবে ভাবিনি। অল্প বয়সে তো কবিতাই লিখতাম। প্রথমদিকে, কলেজজীবনে কবিতাই লিখেছি। সে, কবিতা লিখছি ঠিকই, কিন্তু একটা সময়ে ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কবিতা আমি লিখছি বটে, কিন্তু আমি খুব ভালো যে লিখতে পারব— সেটা হয়তো নয়। আর ছোটোগল্প, উপন্যাস—এসব লেখার কথা আমি কোনোদিন ভাবিনি, একটা নাটক, সেটাও মৌলিক নাটক নয়, হাঙ্গেরিয়ান নাট্যকার জুলিয়াস হে-র দ্য হর্সহ নামে একটা নাটক—সেটার বঙ্গীকরণ করেছিলাম; এখানে একসময় নান্দীকারের খুব বড়ো অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁর প্রভাবে, তাঁর -ই আগ্রহে আমি জুলিয়াস হে-র সেই নাটকের বঙ্গীকরণ করেছিলাম। সেটা কলকাতার মঞ্চে লেখার ক্ষমতা ছিল না। ফলে, ওই দ্য সেকেন্ড বেস্ট বলা যেতে পারে। অন্যেক সৃষ্টিকেই ভালো করে পাঠ করে বোঝার চেষ্টা করেছি। পর্যালোচনা করেছি, বিশ্লেষণ করার চেষ্টা

সৃষ্টিসন্ধান

করেছি। আমার প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে সেই বোঝাটাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছি। তবে একটা কথা ঠিক, একটু-আধটু যে কবিতা লিখেছিলাম, সেই কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা আমার কবিতা সমালোচনার সময় বেশ কাজে লেগেছে। সেটা আমি বলতে পারি।

আকাদেমি হ্যাঁ, আপনার সেই নাটকটা এখানকার মিত্র সম্মিলনী মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। নাম ছিল—এক যে ছিল ঘোড়া। আমরা দেখেছি সেই নাটক। আর-একটা কথা, আপনি বললেন আপনার মৌলিক সৃজনশীলতার ক্ষমতা হয়তো ছিল না— কিন্তু, এটা কিন্তু পরীক্ষিত নয়। সুতরাং আপনি জোর করে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। যাক গে, লেখার সময় বিচার করলে কোন্ সময়টাকে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মানে ভেতরে ভেতরে সবসময় একটা লেখার তাগিদ অনুভব করছেন...এরকম হয়নি কখনও ?

অশ্রুকুমার না। এটা কিন্তু কোনো বিশেষ সময়, বিশেষ ফেজ এসেছে, তেমন নয়। কোনো-কিছু পড়তে পড়তে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। মনে হয়েছে এটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। আমার মনে আছে, খুব একটা মজার ব্যাপার। ক্লাসে আমি পড়াচ্ছি জীবনানন্দ। পাঠটা হচ্ছে, ওই 'আট বছর আগের একদিন', সে কবিতার এক জায়গায় আমি পড়ছি, 'জানিবার', একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল তার বইয়ে আছে জাগিবার। এই যে 'জানিবার' ও 'জাগিবার' দুটো আলাদা শব্দ, এটা আমি খুব ভালো করে পর্যালোচনা করলাম, তারপর আমি একটা প্রবন্ধ লিখলাম—দানিবার ও দাগিবার: একটা পাঠগত সংশয়। এইরকমভাবে অনেকসময় ক্লাসে পড়াতে গিয়ে হঠাৎ খটকা লাগা, পড়তে পড়তে মনের ভেতর কোনো প্রশ্ন জেগে ওঠা, তার থেকেই আমার লেখা হয়েছে। ধরা যাক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ওপর আমার একটা লেখা 'ব্রাত্য কবি, ব্রাত্যের কবি'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর অশোক মিত্র ইকনোমিক্যাল অ্যান্ড পোলিটিক্যাল উইকলি-তে একটি লেখা লেখেন। সেটা পড়ে আমি খুব ক্ষব্ধ হই। সেই ক্ষোভের ফলেই প্রবন্ধটা আমি লিখেছিলাম। কখনো - কখনো একটা তাগিদ কাজ করেছে, সেই তাগিদের ফলেই আমি লিখেছি। কোনো সময় হয়তো সম্পাদকরা অনুরোধ করেছে নিদিষ্ট বিষয়ের ওপর লেখা দিতে। সেই বিষয় হয়তো নির্দিষ্টভাবে আমি মানিনি, কিন্তু লেখা তৈরি করে দিয়েছি। মোটের ওপর পড়তে যখনই মনের ভেতর প্রশ্ন জেগেছে, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি আমার লেখার ভেতর দিয়ে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি। আমার নিজেরই সংশয়মুক্তি পথ আমার এসব লেখা।

আকাদেমি দুটো ব্যাপার বেরিয়ে এল। এক : কিছু লেখা আপনি লিখেছেন নিজের মনের ভেতর জেগে ওঠা প্রশ্নের পীড়া থেকে মুক্তির জন্য, সংশয় অতিক্রম করার জন্য। দুই : নেহাতই সম্পাদকের অনুরোধে লেখা। আমার মনে হয় প্রথম ধরনের লেখার জন্য আপনি বেশি তৃপ্তি পেয়েছেন।

অশ্রুকুমার হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। কিন্তু অনেকসময় মজা হয়। সম্পাদকীয় তাগাদাতেও... আমার মনে আছে বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর উপলক্ষ্যে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্খকে একটা প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। শঙ্খ সেই প্রবন্ধটা লিখতে পারেনি। শঙ্খ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার নাম প্রস্তাব করে। উনি আমাকে অনুরোধ করেন। আমিও প্রথমে ভাবি দুশো বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাস লেখার কী মানে হয়। তখন আমার মনে হল—আচ্ছা, এভাবে দেখি না কেন। সে, এই যে ছাপাখানা হল, তার ফলে বাংলা কবিতার কী পরিবর্তন হল। এ দুটোকে যদি যুক্ত না করি, তাহলে এ লেখার কোনো মানে নেই। তার ফলে আমি বেশ বড়ো একটা প্রবন্ধ লিখতে পেরেছিলাম। শুনে, বিপুল তুমি খুশি হবে, নীহাররঞ্জন রায় এ বইটার রিভিয়ু করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, টেকনোলজিও সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তার একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হচ্ছে এই প্রবন্ধ। অনেকসময় সম্পাদকের তাড়নাতে লেখা প্রবন্ধও ঠিক রুটিন লেখা থাকে না। তাদের অনুরোধও অনেকসময় নতুন ভাবনাকে উদ্দীপিত করে, চিন্তার পথ খুলে দেয়।

আকাদেমি অনেকদিন কলেজস্ট্রিট পত্রিকায় আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ লেখা বেরিয়েছিল লেখকের স্বাধীনতা রাজনৈতিক দায় নিয়ে। সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অনেকটা আলচনা করেছিলেন। আপনার কি মনে হয় না এই সমস্যা সৃষ্টিশীল মানুষকে চিরকালই বিদ্ধ করেছে। এ নিয়ে পরবর্তী কি আরও বড়ো কোনো কাজের কথা ভেবেছেন।

অশ্রুকুমার আসলে আমি এ বিষয় নিয়ে একটা-দুটি লেখা বেশ আগের থেকেই লিখছিলাম। কিন্তু খুব বড়ো লেখা লিখেছিলাম 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তি' নামে, সেটা শিবনারায়ণ রায়ের জিজ্ঞাসা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এবং আমি, মানে একটা খুব...বললে বাড়িয়ে বলা হবে কি না জানি না—গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় পুর্নমুদ্রিত হয়েছে। তারপর , সেটা আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে, 'ব্রাত্য কবি, ব্র্যাত্যের কবি' লেখাটির কথা উল্লেখ করলাম, সেখানেও এই সমস্যার কথা আমি লিখেছি। সম্প্রতি এই বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক বেশি ভেবেছি। কারণ আমার এখনকার চিন্তা বিশুদ্ধ সাহিত্যচিন্তার চেয়ে সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক চিন্তাটা বেশি আসে। এখন আমি, বিশেষ করে কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্র এবং শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীর যে স্বাধীনতা বা সৃষ্টিশীলতার দিকে কমিউনস্ট আমলাতন্ত্রের যে ভূমিকা, বা প্রভাব, বলা যেতে পারে ক্ষতিকারক প্রভাব—এটা নিয়ে আমি চর্চা করছি। আমার কিছু প্রবন্ধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আশাকরি ব্যাধি, অর্থনৈতিক দৈন্য— এসব নিয়ে আপনি বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

অশ্রুকুমার আসলে আমি বলেছিলাম যে, বলা হয় দারিদ্র্য বা নেশার প্রতি আসক্তি—এগুলো তাঁর শেষদিককার সৃজনশীলতার

সৃষ্টিসন্ধান

অভাবের কারণ। কিন্তু শেষদিকে তিনি নিজের দল থেকেই সহযোদ্ধাদের দ্বারা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেটাই তাঁকে বিদ্ধ করেছিল বেশি। দারিদ্র্য, আসক্তি এসব তো ছিলই।

আকাদেমি দেশভাগ এবং বোবা বাংলা সাহিত্য— এ বিষয়টা মনে হয় আপনাকে বেশি তাড়িত করেছে। আপনার সাম্প্রতিক অনেকগুলো লেখায় বিষয়টা উঠে এসেছে। এগুলো গ্রন্থনা করে বড়োমাপের কোনো কাজের কথা ভেবেছেন? এই লেখাগুলোর প্রস্তাবনা, উদ্দীপনা প্রথমে কীভাবে এসেছিল?

অশ্রুকুমার জান, আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, আমাদের দেশ যদি বল, গ্রামের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। কিন্তু বাবা যেহেতু এই উত্তরবাংলায় চাকরি করতেন, সেজন্য আমাদের পৈতৃক যে বাড়ি, বাবার নিজের জমিটমি ইত্যাদি—সেসব গিয়েছে বটে, কিন্তু যাতে প্রকৃত অর্থে উদ্‌বাস্তু হওয়া বলে, তা তো আমরা কখনও হইনি। উদ্‌বাস্তু মনের বেদনা তাদের মতো করে আমরা বুঝতে পারিনি। কোনো ক্যাম্পে আমাদের থাকতে হয়নি কোনোদিন। এমনকি উদ্‌বাস্তু হওয়ার যে সরকারি সুযোগসুবিধা— কিছুই আমরা নিইনি। কিন্তু নানা লেখা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে...এই উদ্‌বাস্তুদের বেদনা আমাকে ভেতরে ভেতরে ভীষণ পীড়িত করছে, আমার মনে হয়েছে অমিও তো বাবার - মায়ের হাত ধরে এভাবে পথে পথে বেরিয়ে পড়তে পারতাম। এটা হয়তো আমারও নিয়তি হতে পারত। আসলে সাহিত্য পড়লে আমার ভেতরে যদি এই সমবেদনার বোধ না জাগে, তবে সাহিত্যপাঠের মানে হয় না। সারাজীবন যে সাহিত্য পড়লাম, তা থেকে অন্তত এটুকু উপলব্ধি হওয়া উচিত যে, সমবেদনার বোধ আমি অর্জন করতে পেরেছি। আমি যখন এম এ পড়ি, তখন অনেক বন্ধুবান্ধবী দেখেছি, যারা পুর্ববাংলা থেকে চলে এসেছে। তাদের দেখে তাদের মনের ভেতরের শেকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণাটা টের পেয়েছি। আমার মনের ভেতরে সেসব কথা অনেকদিন ধরে জেগে থেকেছে। কখনও আলোড়ন তুলেছে, তারপর একসময় আমার মনে হয়েছে কেন এদের কথা বাংলা সাহিত্যে যতটা প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিল, সেটা হয় না। এটা... বাংলা সাহিত্যের এই নীরবতার কারণটা কী। সেটা আমি একসময় তদন্ত করতে, খুঁজতে শুরু করি। তখন আমার মনে হয় আমার এই বর্তমান আলোচনা আর ওই সন্ধান প্রায় মিলে যাচ্ছে। তখন আমার মনে হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, সেই প্রগতি সাহিত্যের একটা তত্ত্ব ছিল যে কিছুতেই...পাছে সাম্প্রদায়িকতা ঘটে যায়...এটা একটা আতঙ্ক ছিল। সুতরাং সাহিত্য যদি সত্যি কথা বলতে গিয়ে এমন কথা বলে ফেলে, যা পলিটিক্যালি কারেক্ট নয়—সেটা বলা চলবে না। এই করতে গিয়ে দুরকম হয়েছে। এক : নীরবতা। দুই : সবসময় ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা। যখন সমরেশ বসুর একটা গল্পে চরিত্র পাশাপাশি বসে বিড়ি খায়, একজন হিন্দু, অন্যজনকে মুসলমান হতেই হয়। এই ব্যাপারটা সবসময় করার চেষ্টা হয়েছে। এসব নিয়ে কয়েকটা প্রবন্ধ লেখার পর আমার একটা ছোটো বই প্রকাশিত হয়েছে ভাঙা ও বাংলা সাহিত্য নামে। হয়তো এটা আরও বিস্তৃত করে লেখা যেতে পারত, কিন্তু আমারও বয়স হয়ে গিয়েছে...ওই যেটা লিখেছি, ওটাই থাকবে। বিস্তৃত করে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়তো প্রকাশ করতে পারব না। তার মধ্যে আমি লিখেছি বাংলা সাহিত্যে নিম্নবিত্তের মানুষ, যারা দণ্ডকারণ্য মরিচঝাঁপিতে গেল, তাদের কথা বলা সাহিত্যে একেবারেই নেই।

আকাদেমি আপনি যাদের কথা বললেন, পুববাংলা থেকে চলে আসা উচ্চবর্ণ, উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি তারা কিন্তু পরবর্তীকালে রিফিউজি তকমা ঝেড়ে ফেলে অনেকেই বেশ সামাজিক এবং আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। নিরন্ন, নিরাশ্রয়, প্রান্তিক মানুষজন, যারা দণ্ডকারণ্য বা মরিচঝাঁপিতে নির্বাসিত হল, তাদের কথা কেউ উচ্চারণ করল না।

অশ্রুকুমার সম্প্রতি আমি একটা বই পেয়েছি। লেখকের নাম এখনই মনে করতে পারছি না, দাঁড়াও, এখানেই কোথাও বইটা আছে। হ্যাঁ, পেয়েছি, একটি বৃত্তে চণ্ডালজীবন, লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তিনি একেবারেই ওই নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের মানুষ। দণ্ডকারণ্যে ছিলেন। সেখানকার সেই অভিজ্ঞতার কথা...এই হচ্ছে বলতে পার নীরবতা একটু একটু ভাঙছে।

আকাদেমি অমিতাভ ঘোষের হাংরি টাইডস্-এ সামান্য আছে—

অশ্রুকুমার হ্যাঁ, কিন্তু তাদের কথা নয়। আমরা, আমরা বলছি আমাদের মতো করে।

আকাদেমি বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে প্রথাগত নিরাপদ ভঙ্গির বাইরে এসে খুব দক্ষ, শক্ত হাতে বিস্ফোরক কোনো বিষয় বা শৈলীর পরীক্ষানিরীক্ষা করে কারও লেখা বিশেষ চোখে পড়ছে না। অথচ বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা ছোটোগল্প স্বকীয়, গুরুত্বপূর্ণ। ব্যতিক্রম দু-একজন আছেন। নবারুণ ভট্টাচার্য, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কমলকুমার, অমিয়ভূষণ বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় চলে যাওয়ার পর শূন্যস্থান কিন্তু পূর্ণ হল না।

অশ্রুকুমার আমি আসলে ছোটোগল্প নিয়ে যে খুব ধারাবাহিক কাজ করেছি, তেমন বলা যাবে না। আমি সাহিত্য আকাদেমির হয়ে দু-খণ্ডে বাংলা ছোটোগল্পের সংকলন করেছিলাম। তৃতীয় খণ্ডটা যদি করতাম, তাহলে যে পর্বের কথা তুমি বলছ, সেই পর্বের ছোটোগল্প আমাকে তন্ন তন্ন করে পড়তে হত। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ায় সে কাজ আমি করিনি। আমার মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়। কিন্তু যেটা আমার মনে হয়, হচ্ছে যে, পত্রিকার একটা তাগিদ এবং পত্রিকার একটা আদর্শ, সেটাই প্রধানত এটা করেছে। আর লিট্‌ল ম্যাগাজিন কবিতার ক্ষেত্রে যতটা পরীক্ষামূলকতার পরিচয় দিয়েছে, ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে ততটা এগিয়ে আসেনি। তার ফলে

সৃষ্টিসন্ধান

ছোটোগল্পে নতুন আঙ্গিককে বলার চেষ্টা, পরীক্ষামূলক ন্যারেশনের ভঙ্গি, চমকপ্রদ অভাবিত বিষয়— খুবই কম।

আকাদেমি পত্রিকার বাণিজ্যমুখিনতা কি এর একটা কারণ বলে মনে হয়?

অশ্রুমার হ্যাঁ, বাণিজ্যসফল পত্রিকার একটা প্রভাব তো লেখকের ওপর পরোক্ষভাবেই কাজ করেই। বাণিজ্যমুখী পত্রিকার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লেখককে প্রভাবিত করে এটা অবশ্য আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। কিন্তু মনে হয়, কিছুটা কাজ করে।

আকাদেমি বড় বাণিজ্যিক কাগজের প্রধানত বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার চেয়ে বিনোদনের দিকেই প্রবণতা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো সিরিয়াস পাঠকের কাছে সেই অন্য শৈলী, প্রথাগত নিরাপদ ব্যাকরণের বইএর একটা নতুন সাহিত্যের ধারা তুলে ধরতে পারত, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সেরকম উদাহরণ প্রায় আণুবীক্ষণিক।

অশ্রুকুমার লিট্‌ল ম্যাগাজিনও সেই কর্তব্য সবসময় পালন করে না। লিট্‌ল ম্যাগাজিন বলতে যে একটা, কী বলব, একটা অন্যরকম ধারণা, একটা মোহ, উন্মাদনা বা আবেশ তৈরি হয় আমাদের মনে। বেশির ভাগ লিট্‌ল ম্যাগাজিন কিন্তু কতগুলো লেখা, চেনাশোনা লোকজনের, জাস্ট দু-মলাটের ভেতরে...মনে হয় যে দায়ভার নিতে পারত, সেটা সবসময় পালন করেনি। মানে, বাণিজ্যিকভাবে অসফল, এটাই যেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়াল।

আকাদেমি পাঠকের ঝুঁটি ধরে নাড়া দেবে, এরকম লেখা কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিরল হয়ে এসেছে। অথচ দেখুন পঞ্চাশ, ষাট, একনকি সত্তর দশকেও বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ, মুস্তফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—দেখুন মুস্তাফা সিরাজের 'গোম্ব', শীর্ষেন্দুর 'উত্তরের ব্যালকনি', বিমল করের 'আঙুরলতা', কমলকুমারের 'মতিলাল পাদরি'...

অশ্রুকুমার হ্যাঁ, 'উত্তরের ব্যালকনি' গল্পটি আমি আমার সংকলনের জন্য নির্বাচন করেছিলাম। আর-একজন মহিলা, একসময় তার লেখা দেখতাম, বেশ ভালো লাগত। কী ঘোষ... এখন আর বেশি দেখি না। ওর স্বামী বোধহয় হিন্দুস্থান কেবলস্-এ কাজ করতেন।

আকাদেমি আলপনা ঘোষ?

অশ্রুমার আলপনা ঘোষ। আমাকে একসময় বেশ আকৃষ্ট করেছে পরবর্তীকালে তেমন আর দেখছি না।

আকাদেমি কবিতার কথায় আবার আসছি স্যার। এর আগে একবার আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম কবিতা কি সভ্যতার বা আমাদের এই জীবনচর্যার সত্যিই কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আপনি বলেছিলেন ভাষা যেখানে একটা সত্যকে ধারণ করে, ব্যাপারটা আপনার কাছে আরও একবার শুনতে চাই।

অশ্রুকুমার কবিতা কী করে? কী কাজে আসে কবিতা? কেউ যদি সারাজীবনে একটিও কবিতা না পড়ে, তারও কিছু আসে যায় না, কবিতারও কিছু আসে যায় না। সাংসারিক জীবনযাপনে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু কবিতা, বলা যেতে পারে সাহিত্যের সারাৎসার কবিতায় বিধৃত হয়। নির্যাসটুকু। একটা ছোটোগল্প, একটা উপন্যাস আমরা পড়ি। আমরা তো অত নিখুঁতভাবে মনে রাখতে পারি না। কিন্তু কবিতার একটা-দুটো লাইন এমন অমোঘভাবে আমাদের বিদ্ধ করে, যে তার থেকে আমাদের আর কোনো পরিত্রাণের পথ থাকে না। ভাষায় এমন একটা অমর ভঙ্গিমা, সত্যের একটা উপলব্ধি যেন ধরে রাখে, সেটাই অমর হয়ে থাকে। আর কোনো বিকল্প হয় না। যে একবার ওই কবিতাকে ওইভাবে পড়েছে, সে তো বারবার কবিতার কাছে ফিরে আসবে। কবিতার কাছে ফিরে না এসে তার আর কোনো উপায় নেই।

আকাদেমি চমৎকার একটা উপমা আপনি এইমাত্র দিলেন। ভাষার অমর ভঙ্গি। এই উপমারও বোধহয় কোনো বিকল্প নেই। আচ্ছা, ঔপনিবেশিক মডেল থেকে বেরিয়ে বাংলা উপন্যাসের যে দেশজ পদ্ধতিতে নবনির্মাণ—সতীনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতি, অমিয়ভূষণ—এই ধারা কি সার্থকভাবে বহমান? একদম নবীন প্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের লেখায় বহুমাত্রিকতা বা বিষয়ের বৈচিত্র্য এসেছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও যেন মনে হয় সেই ধ্রুপদি বিন্যাসের অভাব, যে 'সত্য' অন্বেষণের কথা আপনি বললেন, তার খামতি থেকে যাচ্ছে।

অশ্রুকুমার না, এটা খুব একটা ভাবার বিষয় নয়। কারণ, অধিকাংশ লেখাই যে এই স্তরে পৌঁছোবে, তা তো হয় না। একটা সাধারণ স্তর থাকে। এমন, একটা ঘটনা, গত তিরিশ - চল্লিশ বছর ধরে আমাদের গ্রামাঞ্চলে বা শহরে রাজনীতি, সমাজনীতি, এসব নিয়ে যে সংঘাত, সেগুলোই নানাভাবে রূপায়িত হচ্ছে। সেগুলোই ফুটে উঠছে, বা মধ্যবিত্তের জীবনযাপন যে বদলে যাচ্ছে, এই যে... কী বলব, ভুবনায়নের কথা হোক বা আর্থসামাজিক যে পরিবর্তন, এই যে তুমি একটু আগে বলেছিলে ডায়াস্পোরার কথা—আমাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে যাচ্ছে, অনেকে চিরকালের জন্য থেকে যাচ্ছে, ওরাও এদেশে আসছে, এখন তো বিদেশযাত্রা অনেক সহজ হয়ে গেছে, তারাও তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছে। এর ফলে আমাদের জীবনযাত্রাতেও একটা বিপুল পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে। সেই সামাজিক পরিবর্তনের রূপটা আমাদের ছোটোগল্প, উপন্যাসে খুবই আসছে। এখন যদি আমাদের জীবনযাপনের এই ধারনাটাই সাহিত্যে উঠে আসে, তবে সেটা কতটা দেশজ ভঙ্গি বা দেশজ রীতিতে বলা যাবে বা আদৌ বলা যাবে কি না সে নিয়ে একটা সংশয় থাকে। তারাশঙ্কর বা সতীনাথ তাঁদের মতো করে দেশজ ভঙ্গিতে গল্প বলার ধরণ আয়ত্ত করেছিলেন। এটা বলা যেতে পারে, দেবেশ যে বলেছিলেন, যে

সৃষ্টিসন্ধান

আমরা পশ্চিমি মডেলকে নিলাম, তারা কিন্তু সেই মডেলকে অস্বীকার করে দেশজ মডেলকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই মডেল এখনকার সাহিত্যে কতটা সার্থকভাবে প্রযোজ্য, সেটা একটা সংশয়ের বিষয়। বরং দেখা যায় যে, কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু সেই দেশীয় ভঙ্গি বেশি করে আসছে। সেখানে উত্তর- আধুনিকতা বলতে ওরা যা বলেছেন, সেই যে পশ্চিমি আধুনিকতা, যেটা ত্রিশের দশকের কবিরা ঘটিয়েছিলেন, তার থেকে সরে এসেছে যে দেশীয় রীতিতে সাহিত্য বলা, সেই ধরনটা কবিতায় যতটা আনা গিয়েছে, কথাসাহিত্যে সেটা আমরা আনতে পারিনি।

আকাদেমি তাহলে আমার বলার ভঙ্গি কেমন হবে, সেটা অনেকটাই বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করছে।

অশ্রুকুমার নিশ্চয়, নিশ্চয়ই। আমি তো দেশজ ভঙ্গিতে ডায়াস্পোরিক লিটারেচার লিখতে পারব না। সেটা হতেই পারে না। রামকুমার কখনো-কখনো লিখেছেন। রামকুমার যে বিষয় নির্বাচন করেছেন, তার জন্য ভাষা ও বাক্‌রীতিও সেভাবেই বেছে নিয়েছিনে। সেক্ষেত্রে মানানসই হচ্ছে।

আকাদেমি মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মাণ?

অশ্রুমার হ্যাঁ। সেরকম দেবেশও লিখেছেন।

আকাদেমি প্রগতি লেখক সংঘ, কমিউনিস্ট পার্টি, পরে তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতি, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা— এসব নিয়ে একটা বড়ো লেখার কথা বলেছিলেন। লেখা নিশ্চয় হয়ে গিয়েছে। সে বিষয়ে দু-একটি কথা কি বলবেন!

অশ্রুকুমার তুমি হয়তো খেয়াল করনি, সে লেখা তো অনুষ্টুপ-এ প্রকাশিত হয়ে গেছে। অনুষ্টুপ-এ বেরিয়েছিল প্রগতি লেখক সংঘ নিয়ে। পরের সংখ্যায় বেরিয়েছে গণনাট্য সংঘ নিয়ে। সেখানে যেমন একদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়— এদের সৃজন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির যে ভূমিকা, সেটা যেমন রয়েছে, আবার বিষ্ণু দে, তারাশঙ্করের সঙ্গে সম্পর্ক, তারপর শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত— এঁদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির যে সম্পর্ক, গণনাট্যের যে সম্পর্ক, সেসব নিয়ে আলোচনা করেছি। সেটাই আমার প্রত্যুয়মান বই-এর একটা পর্বে রয়েছে।

আকাদেমি প্রাচীনকাল থেকেই বোধহয় সৃষ্টিশীল মানুষের সৃজনক্ষমতার ওপর আধিপত্য করতে চেয়েছে রাজনীতি। তার সৃষ্টিক্ষমতাকে নিজের তাঁবে রেখে তাকে দিয়ে রাজনৈতিক মতবাদের স্বপক্ষে বলানোর চেষ্টা হয়েছে। তাকে প্রভাবিত করে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে রাজা, প্রশাসন, রাষ্ট্র। ফলে শিল্পীর আত্মপীড়ন কখনও দুঃসহ হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে তো বারবার এসব ঘটেছে।

অশ্রুকুমার দ্যাখো, যে-কোনো শিল্পসৃষ্টি একজন স্বাধীন মানুষের কাজ। একটা কবিতায় কেন এই শব্দটা ব্যবহার না করে ওই শব্দটা ব্যবহার করব, তার মধ্যেও তোমার স্বাধীনতা কাজ করে। সৃজনশীলতার মধ্যে থাকে উদ্ভাবনা, তার মধ্যে থাকে প্রতিভা, তোমার সৃষ্টির জন্য প্যাশন। পলিটিক্যাল পার্টি চাপিয়ে দেয়, আরোপ করে। তা ছাড়া, আমি মনে কবি সাহিত্য নিঃশব্দে সমস্ত সরকারি ব্যবস্থা, সরকারি নিষেধের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করে। সে কিন্তু জোর করে কিছু উচ্চারণ করে না। কিন্তু সে যদি প্রতিবাদ করতে ভুলে যায়, তাহলে সেটা আর সাহিত্য থাকে না। যা ঘটেছে, যা ঘটানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সাহিত্য হচ্ছে একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

আকাদেমি সাম্প্রতিক কালের বাংলা উপন্যাস কোন্‌টা পড়ে আপনার ব্যতিক্রমী মনে হয়েছে?

অশ্রুকুমার উপন্যাসের কথা যদি বলতে হয়, একজনের কথাই আমি বলব বিশেষ করে। দেবেশ রায়ের কথা। দেবেশের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-এর কথা সবাই বলে। খুবই উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু তুমি তো পড়েছ, তিস্তাপুরাণ, একটা নদী, তার যেমন স্রোতের বহমানতা, তেমনি একটা রাজবংশি সমাজ— তার যে পুরাণকথা, দুটো যেন মিশে গিয়েছে। তিস্তা স্রোতের মতো এই রাজবংশি সমাজও তার সব লোকাচার, পুরাণকথা, সুখদুঃখ নিয়ে আবহমান। সেটা এই উপন্যাসে অসাধারণভবে এসেছে। আর একটি উপন্যাসের কথা ও বলব। সেটা হচ্ছে বরিশালের যোগেন মণ্ডল। সম্প্রতিকালে অবলম্বন করে, সম্প্রতিকালের ইতিহাসকে অবলম্বন করে এইরকম উপন্যাস বাংলায় আর দ্বিতীয়টি লেখা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তার মধ্যে কৌতুক আছে, ঐতিহাসিক চরিত্রকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা আছে, ইতিহাসের ব্যাখা আছে। জীবনের একটা কার্নিভাল যেন পাই।

আকাদেমি ফজলুল হক সাহেবকে তো কখনো কখনো মনে হয়েছে একজন সাধারণ গ্রামীণ মানুষ, আচ্ছা, বাংলা সাহিত্যে, বাজার-সহ অমিয়ভূষণের কি সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে? মনোরঞ্জনী, মনোহারী মোড়কের লেখা তিনি কোনোদিন লেখেননি। কথাবার্তায় এক ধরনের বনেদিপনা, একটা দম্ভ... কিন্তু আজীবন নিজের মাটি আঁকড়ে থেকে... হয়তো আরও বেশি পাদপ্রদীপের আলো না পাওয়ার সেটাও একটা কারণ। আপনার কী মনে হয় স্যার?

অশ্রুকামার এটা তো সাহিত্যে সবসময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ব্যক্তিগত যে ধ্যানধারণা, যে মতবাদ—অনেকসময় তার সাহিত্যই সেটার প্রতিবাদ করে। আমারও কখনও তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তায় মনে হয়েছে ব্রাহ্মণ্য অহমিকা, একটা জমিদারি মেজাজ, এসব তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু যখন তিনি গড়শ্রীখণ্ড লিখছেন, তখন আবার তাদের কথাই বড়ো হয়ে উঠছে। মনে আছে তো, সুরতুনের কথাই কেমন বড়ো হয়ে উঠছে। যখন তিনি মহিষকুড়ার উপকথা লিখছেন, তখন সেই বাথানের মানুষটির কথাই বড়ো হয়ে উঠেছে। সুতরাং ব্যক্তিলেখককে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যে শিল্পীলেখক, শেষপর্যন্ত তারই প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে, তিনি যদি সত্যিকারের বড়ো লেখক হন। অমিয়ভূষণের উল্লেখযোগ্য লেখার মধ্যে সেই ব্যক্তি অমিয়ভূষণকে ভেঙে শিল্পী অমিয়ভূষণের জাগরণ

সৃষ্টিসন্ধান

ঘটেছে। সেইসব ক্ষেত্রে তুমি বড়ো লেখক হতে পারবে।

আকাদেমি সম্প্রতি প্রয়াত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সম্পর্কে, তাঁর লেখার বহুমুখিনতা, বিচিত্র জীবনচর্যা, বাংলা সাহিত্যে একটা আলাদারকম ভঙ্গি...অলীক মানুষ, মায়ামৃদঙ্গ, অসংখ্য ছোটোগল্প, ভাষাতত্ত্ব...সব মিলিয়ে কী মনে হয় আপনার? তাঁর অবস্থান বিষয়ে...

অশ্রুকুমার অবস্থান নির্ণয় করা সমসাময়িকদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়। আসলে আজ আমরা যা বলব, পরবর্তী কাল তার কতটুকু মূল্য দেবে—তা কেউ জানে না। আমাদের বিচার কতটুকু টিকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমরা তো অলীকমানুষ 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের একটা ক্লাসিক পর্যায়ের লেখা বলে মনে হয়েছে। কিছু ছোটোগল্প আমার খুবই ভালে লেগেছে। তাঁর 'গোঘ্ন' গল্পটি আমার খুবই প্রিয়। আর -একটা দিক ছিল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের। এ মানুষটা তো কোথাও কোনো শিক্ষার ধার ধারেনি। কিন্তু কতকগুলো বিষয়ে ওঁর শিক্ষার যে ব্যাপ্তি ছিল, সেটা অসধারণ। আমি আগেও কিছু কিছু জানতাম। সম্প্রতি তাঁর যা জ্ঞান, সেটা অপরিমেয়। সেটা আমাকে...শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি আমার মাথা নীচু হয়ে গেছে। শুধু কল্পনা নয়, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে ছিল একটা অসাধারণ মননশক্তি, যেটা বাংলা সাহিত্যে খুব বিরল নিদর্শন। সেই কল্পনাশক্তি আর মননশক্তির সার্থক মেলবন্ধন ঘটাতে না পারলে অলীকমানুষ লেখা যায় না।

আকাদেমি আপনি 'গোঘ্ন'র কথা বললেন, এরকম আরও দু-একটা গল্প আমাকে খুব আচ্ছন্ন করেছিল। একটি বানুকের উপকথা, রানীর হাটের বৃত্তান্ত, সূর্যমুখী, মৃত্যুর ঘোড়া। স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্য উদ্‌ঘাটনই যদি লেখকের শেষ দায় হয়, তবে সেই সত্যকথনের ফলে যদি 'যেমন আছে, থাকুক' এই নিরাপদ স্থিতাবস্থা টালমাটাল হয়ে যায়, সামাজিক বিপর্যয়ও ঘটতে পারে, তখনও কি তিনি সে সত্যকথনকেই শ্রেয় করবেন?

অশ্রুকুমার আসলে সত্যকথা বলা, উদ্‌ঘাটনের এরকম প্রচারের ধরণ থাকে। আমি সেটা তত বলছি না। আমি বলতে চাইছি সত্যকে তার সাহিত্যে ধারণ করা। তিনি সত্য কথা বলার জন্য রাস্তায় নামতে পারেন। মঞ্চে দাঁড়াতে পারেন। যেমন এমিল জোলা দ্রেফুজ মামলার সময় 'আই অ্যাকিউজ' বলে যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটা তাঁর নাগরিক কর্তব্য। তাঁর লেখার পরিচয় হয়তো তাঁর নাগরিক পরিচয়কে জোরালো করেছে। কিন্তু তিনি যখন লেখক, তিনি যখন কবি, তখন সত্যকে তার লেখার মধ্যে ধারণ করাটাই তাঁর ধর্ম। এবং তারপরে, তার ফলে কী হল। সামাজিক অবস্থা টালমাটাল হল কি না, স্থিতাবস্থা বিচলিত হল কিনা— সেটা দেখা তার কাজ নয়। সেই পরিণাম তার ভাববার কথা নয়।

আকাদেমি আমার শেষ প্রশ্ন—জীবনের এই পর্বে এসে পেছন ফিরে তাকালে কোন্ দৃশ্যগুলো উজ্জ্বল মনে হয়?

অশ্রুকুমার (বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর) এই মুহূর্তে তিনটে ছবির কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। একটা : বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোশ বিল্ডিং -এর চারতলায় লাইব্রেরিতে বসে গুটিকতক ছেলেমেয়ে পড়ছি। তার মধ্যে আমি একজন। সেই নিস্তব্ধতায় আমি পড়ছি আদ্রে জিঁদের ফ্রুটস্ অফ দা আর্থ। এই ছবিটা দেখতে পাই আমি। আর - একটা : আমি তরুণ অধ্যাপক হিসাবে কলেজে পড়াতে যাচ্ছি। সামনের মাঠ ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছি। আর তখন কলেজের পেছনে কোনো বড়ো বড়ো বাড়ি হয়নি। আমি শরৎকালের ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে হেঁটে যাচ্ছি। কোনোদিকে তাকাচ্ছি না। আমার দৃষ্টি শুধু ওই রৌদ্রস্নাত কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। আর - একটা দৃশ্যের দিকেও তাকিয়ে থাকি। আমার বড়ো মেয়ের কল্যাণে একবার বিদেশভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। আমরা ভেনিস থেকে জাহাজে করে মুরানো বলে একটা দ্বীপের দিকে যাচ্ছি। নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমাদের স্টিমারটা চলেছে। সেই নীল জল, নীল জল আর নীল জল আমি দেখতে দেখতে যাচ্ছি। পেছন ফিরে তাকালে আমি এই দৃশ্যগুলো বারেবারে দেখতে পাই।

আকাদেমি অসাধারণ! পারিবারিক কোনো বিশেষ সুখের মুহূর্ত নয়, নির্মোহ এবং নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে আপনি বললেন, সুন্দরকে দেখার আপনার যে অসাধারণ অনুভূতি হয়েছিল, যা আপনার মনে চিরস্থায়ী একটা ছবি এঁকে দিয়েছে। এটাই বোধহয় আমরা যা আলোচনা করছিলাম, সত্যদর্শন—তাই। আমাদের উপনিষদের কথাই উঠে এল। সত্য আর সুন্দর আলাদা কিছু নয়। যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রবহমান শক্তির দুটো রূপ মাত্র, যা অভেদ। আপনার সুন্দরকে দেখা-ই সত্যদর্শন। আপনাকে আমাদের প্রণাম। অসংখ্য ধন্যবাদ।

সৃষ্টিসন্ধান